দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...04 SEP 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

ভর্তি সমস্যা ॥ এখনি ভাবা উচিত সমাধানের কথা

মাসুদুজ্জামান

জনকণ্ঠেরই খবর, এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় পাস করা ১ লাখ ৬৯ হাজার ছাত্রছাত্রী কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। হাজারো সমস্যায় জর্জরিত ১২ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশে সংখ্যাটি আপাত অর্থে নিরীহ, সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যিই কি নিরীহ? অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে ব্যর্থতার সূচক হিসাবে কি তা আমাদের সমাজ ও জনমানস কাঠামোতে কোন অভিঘাত তুলবে না? পরিবার, পরিপার্শ্ব, দেশ কি অনাক্রান্ত থাকবে? এইসব প্রশ্ন যখন উত্থিত হয়, তখন সহজেই বোঝা যায় বিষয়টি গুরুতর। এ এক অভিনব, কিন্তু নতুন সমস্যা। তবে এই সমস্যার গভীরতা কতখানি? এর পরিসরই বা কতটা বিস্তৃত? সঙ্কটের কোন্ অতলেই বা তা আমাদের টেনে নিয়ে যাবে?

প্রথমেই বিবেচনায় আনা যাক সমস্যার অবয়বটি কেমন। সংখ্যাতত্ত্বের শরণাপন্ন হলে নিঃসন্দেহে অচিহ্নিত থাকবে না কোন্ অতলে নেমে যাচ্ছি আমরা। সেই সঙ্গে টেনে নামাচ্ছি আমাদেরই আগামী প্রজন্মকে। হিসাবটা জনকণ্ঠেরই, সমর্থন মিলছে শিক্ষা পরিসংখ্যান থেকে। বাংলাদেশে সরকারী বেসরকারী মিলিয়ে কলেজের সংখ্যা ৯৮০। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এই সব কলেজের মোট আসনসংখ্যা ৩-লাখ ২১ হাজার ৬০। অথচ এবার চার বোর্ড থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা চার লাখ ৯০ হাজার ৯১। অর্থাৎ আসনসংখ্যা ও পাস করা ছাত্রছাত্রীর তুলনামূলক ছবিটা হচ্ছে, ১ লাখ ৬৯ হাজার ছাত্রছাত্রীর এবার কলেজে ঠাঁই হবে না। দ্বিতীয় বিভাগ পাওয়া বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। এই সঙ্কট সবচেয়ে তীব্র হয়ে দেখা দেবে ঢাকা এবং অন্য প্রধান প্রধান শহরের কলেজগুলোতে। মানের দিক থেকে নিচু কলেজগুলোতে প্রথম বিভাগ থাকলে হয়তো ভর্তি হওয়া যাবে, কিন্তু ভাল কলেজগুলোতে স্টার মার্ক পেয়েও ভর্তি হওয়া যাবে না বলেই মনে হয়। গত বছরই দেখা গেছে ঢাকার ভাল কলেজগুলোতে বিজ্ঞান বিভাগে যারা ভর্তি হতে পেরেছে তাদের নম্বর ছিল ৮০০'র ওপরে। বাণিজ্য ও মানবিকে স্টার মার্কের নিচে নয়। আর এবার গতবারের তুলনায় পাস করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বেড়েছে ৮৫ হাজার ৬৯৭। ফলে কলেজে ভর্তির চাপ যে কত তীব্র হয়ে উঠেছে, তা সহজেই অনুমেয়।

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অবশ্য বলা হয়েছে এই চাপ মোকাবিলার জন্য এবছর কলেজগুলোতে দু'টো শিফট চালু করা যায় কি না, চিন্তাভাবনা চলছে। বিবেচনাধীন এই প্রস্তাব কলেজগুলোতে ভর্তির যে চাপ পড়ছে, তা কিছুটা হলেও মেটাতে পারে। কিন্তু তা এতই অনুল্লেখযোগ্য যে, মূল সমস্যার ব্যাপকতা কমিয়ে প্রকৃত কোন সমাধান আনতে পারবে না। সরকারী কলেজগুলোতে রাতারাতি যে দুই শিফট চালু করা যাবে, সে রকম বাস্তব অবস্থাও নেই। নেই তার কারণ, কলেজভবন বা ক্লাসরুম থাকলেই তো হবে না, চাই পর্যাপ্ত শিক্ষক। ল্যাবরেটরি বা আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা। সরকারী কলেজগুলোর যদি এই অবস্থা হয়, বেসরকারী কলেজগুলোর অবস্থা যে কি তা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষক তো বটেই অধিকাংশ কলেজে নেই ক্লাস নেয়ার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞদের মতে সারা দেশের কলেজগুলোতে ছাত্রভর্তির প্রচণ্ড চাপের মুখে বর্তমানের চাইতে খুব বেশি হলে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত আসন বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু তার পরও বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত থাকবে নিঃসন্দেহে। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েই শেষ হয়ে যাবে তাদের শিক্ষাজীবন।

সঙ্কটের কেন্দ্র মূলত এটাই। অর্থাৎ বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী যাদের সংখ্যা এক লাখের ওপরে, উচ্চমাধ্যমিক ক্লাসে ভর্তি হবার সুযোগ পাবে না। আর তা ঘটবে তাদের ব্যর্থতার জন্য নয়, জাতীয় ব্যর্থতার কারণেই তারা বঞ্চিত থাকবে শিক্ষালাভ থেকে। কিন্তু তারা যদি প্রশ্ন তোলে কেন আমরা বঞ্চিত থাকব, কেন আমাদের শিক্ষার পূর্ববর্তী স্তর পেরুনো সত্ত্বেও পরবর্তী স্তরে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হলো না, তাহলে কিন্তু জবাব দেয়ার কিছু থাকছে না আমাদের।

অর্থাৎ এই সঙ্কটের প্রথম দিক হচ্ছে সরাসরি বঞ্চনার। বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে তাদের যোগ্যতা সত্ত্বেও বঞ্চিত করে রাখবো প্রার্থিত শিক্ষালাভ থেকে। অথচ এ রকমটি হবার কথা নয় একেবারেই। কেননা জাতিসংঘের মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২৬ক ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, "প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে।" এই ধারার শেষের বাক্যাংশটি লক্ষণীয়, "উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে।" কিন্তু আমাদের এইসব হতভাগ্য সন্তান, যারা এবার সাফল্যের সঙ্গে এসএসসি পাস করলো, যাদের অধিকাংশ অভিভাবকেরও সামর্থ্য রয়েছে হয়ত পড়াবার, তাদের জন্য উন্মুক্ত হলো না শিক্ষার পরবর্তী ধাপ। জীবনে জীবন যোগ করতে না পারলে তাদের ভবিষ্যৎ তাই নিঃসন্দেহে তলিয়ে যাবে অনিশ্চয়তার গহবরে।

মনস্তাত্ত্বিকরা বলছেন, বঞ্চনা তরুণ মানসে দু'ধরনের প্রবণতার জন্ম দেয়। হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে যায়, অথবা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিকতারই বিরুদ্ধে। প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ও মূল্যবোধের ধারক হিসাবে যেসব প্রতিষ্ঠান বা ইন্সটিটিউশন আছে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায় তারা। প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যেহেতু খুব সহজ নয়, সহজ নয় তার বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া, ফলে এইসব শিক্ষাবঞ্চিত ছাত্রছাত্রী বিশেষ করে ছাত্ররা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। হতাশা থেকে লক্ষ্যহীন, বিভ্রান্ত। সমাজ থেকে তারা হয়ে পড়বে বিচ্ছিন্ন, পরিবার থেকেও। আর তখনই তার মনে হতে পারে সে 'রুটলেস' বা পরগাছা। সমাজস্রোতের মূলধারার সঙ্গে নেই। এভাবেই বঞ্চনার শিকার হয়ে তার জীবনীশক্তি, সম্ভাবনার শক্তি যাবে নিঃশেষ হয়ে।

শিক্ষাবঞ্চিত তরুণদের প্রতিক্রিয়া আরেকভাবেও ঘটতে পারে। তা হলো জীবনের একেবারে প্রাথমিক পর্বের এই বঞ্চনা তাকে ক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে সমাজেরই বিরুদ্ধে। দেশের বিরুদ্ধে। এ রকম পর্যায়ে সহজেই যা ঘটে তা হলো বিপথগামী হয়ে পড়ে 'তারুণ্য'।

একটা সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ছবি আঁকা যাক। এ বছরের মতো প্রতিবছর যদি এক লাখ ২০ হাজার (প্রতিবছর গড়ে ৫০ হাজার ছাত্রের বাড়তি আসন সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা মনে রেখে) ছাত্রছাত্রী যদি উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হতে না পারে, তাহলে শুধু দু'হাজার সালের মধ্যে ভর্তি হতে না পারা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৮ লাখ ৪০ হাজারে। এই তারুণ্য রাষ্ট্রের কোন বশীকরণমন্ত্র জানা না থাকলে হয়ে পড়বে লক্ষ্যহীন, উড়নচণ্ডী, ভবঘুরে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে জাতি ধীরে ধীরে তৈরি করে চলেছে লক্ষ্যহীন উন্মূল এক বৃহৎ তরুণ সমাজ, যারা সামাজিক ও রাষ্ট্রের ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে সহজেই। বাধ্যতামূলক কর্মহীন অবসর ও লক্ষ্যহীনতা এই তারুণ্যকে উৎসাহিত করতে পারে অপরাধ প্রবণতায়।

অন্যদিক থেকে যদি দেখি তাহলে চাপ পড়বে চাকরির বাজারেও। অর্থাৎ এ বছরই কলেজে ভর্তি হতে না পারা ১ লাখ ৬৯ হাজার শিক্ষার্থী ঢুকে যাবে চাকরিপ্রার্থীদের সারিতে। কিন্তু দেশে কি এত চাকরি আছে? এমনিতেই দেশে বেকারের সংখ্যা এক কোটির ওপরে, তার ওপর এই অতিরিক্ত চাকরিপ্রার্থীদের চাপ কি সরকার বা রাষ্ট্র সইতে পারবে?

সমস্যাটির অন্য একটা মাত্রাও আছে, যা ভেবে দেখা দরকার। যারা উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হতে পারবে না তাদের একটা বড় অংশ, যারা বিত্তশালী, নিঃসন্দেহে চাইবে তাদের সন্তানকে দেশে সুযোগ না পেলে বিদেশে পড়াতে। এতে ঘটবে নানা সমস্যা। বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা যাবে বেরিয়ে দেশ থেকে। আর যারা পড়তে যাবে তারা শুধু উচ্চমাধ্যমিক নয়, উচ্চশিক্ষাও গ্রহণ করবে সেই দেশ থেকে। এভাবেই বিদেশে থাকতে থাকতে তাদের মানসিকতা হয়ে পড়বে বিদেশ ভাবাপন্ন। এদের অধিকাংশই দেশে ফিরে আসবে না। এলেও নিজ বাসভূমে তারা হয়ে থাকবে পরবাসী। ব্যাপারটা যে কত গুরুতর তা এখনই ভাবা দরকার। এর সঙ্গে শুধু শিক্ষা ব্যবস্থা নয়, জাতীয় চেতনার প্রশ্নটিও জড়িত। আমরা কি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে, সংস্কৃতির সঙ্গে শিকড়হীন পরগাছা কোন এলিট প্রজন্মের হাতে দেশের নেতৃত্ব চলে যাক চাইব? নাকি চাইব দেশের সঙ্গে সহমর্মী দেশপ্রেমিক শিক্ষিত কোন শ্রেণীকে? সুদূরপ্রসারী এই প্রতিক্রিয়ার কথা বাদ দিলেও যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বেরিয়ে যাবে প্রতিবছর, তার কিয়দংশ দিয়ে এদেশেই গড়ে তোলা যাবে অনেক কলেজ।

সরকারের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান এই কাঠামোটি নিয়ে তাই ভাববার সময় এসেছে। ইতোমধ্যে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, তাতে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। ড্রপ আউটের সংখ্যা কমেছে। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হতে না পারার ব্যর্থতা যাতে ভবিষ্যতে কোন ছাত্রছাত্রীকে বহন করতে না হয় সে জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থায় সমস্যার সমাধান করা জরুরী।

এ জন্য দেশের সবক'টি সরকারী কলেজে জরুরী ভিত্তিতে আগামী দু'তিন মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করে (বাজেট সংস্থান বাড়িয়ে) দুই শিফট চালু করা যেতে পারে। বেসরকারী কলেজগুলোকেও এই নির্দেশ দেয়া যায়। সমস্যাটি যাতে ভবিষ্যতে প্রকট হয়ে উঠতে না পারে সে জন্য বেসরকারী উদ্যোগে কলেজ স্থাপনের আবেদনগুলো দ্রুত অনুমোদন দেয়া যায়। পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়েও এখনই ভাবনাচিন্তা করা প্রয়োজন। অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পাস করার যে নিয়ন্ত্রণহীন প্রবণতা চলছে, তা এখনই বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। কারণ প্রকৃত মেধা যাচাই বা শিক্ষার্থীর জ্ঞানের মান নির্ধারণ এই পদ্ধতিতে অসম্ভব। দেশে সরকারী উদ্যোগে আরও নতুন কলেজ স্থাপিত হওয়া দরকার। বেসরকারী উদ্যোগেও যাতে স্থাপিত হয় সে ব্যাপারেও উৎসাহ দেয়া উচিত। আর এসবের লক্ষ্য হচ্ছে আমরা চাই না যে আমাদের সন্তানরা উন্মূল, পরিবারবিমুখ, রাষ্ট্রবিমুখ এক প্রজন্ম হিসাবে গড়ে উঠুক।

জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে উন্মূল, পরগাছা কোন শ্রেণী নয়, সকর্মক, সম্পৃক্ত মানুষই হচ্ছে উন্নয়নের প্রধান সহায়ক। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এজন্যই সেবামূলক কর্মকাণ্ডে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কে কতটা অংশগ্রহণ করতে পারছে, কতটা ভোগ, তার ওপরেই জোর দিয়েছেন। জোর দিয়েছেন মানুষের 'সক্ষমতা বৃদ্ধির' ওপর। উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হতে না পারা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনবোধে এই সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিতে হবে। এ জন্য ভবিষ্যতে তারা যাতে শিক্ষার সুযোগ পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। আর তা না করতে পারলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে যারা কাজ চায় তাদের জন্য কাজ। এই কাজের সংস্থান হতে পারে নানাভাবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে অনেকাংশে সমাধান করা যায় এই সমস্যার।